শস্য সুরক্ষা

আমরা একত্র আজ শস্য সুরক্ষায়

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৮

যুগ্ম সম্পাদক:

মনোজ রঞ্জন ঘোষ

নীলাংশু মুখার্জী

মুখ্য উপদেষ্টা : চিত্রেশ্বর সেন

সচিব : শান্তনু ঝা

অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেণ্ট ইন প্লাণ্ট প্রটেকসন (এএপিপি)

প্লাণ্ট প্রটেকস্‌ন ইউনিট, বি.সি.কে.ভি

মোহনপুর, নদীয়া ৭৪১২৫২

SASHYA SURAKSHA
Sept Issue : 2008
Quaterly Bulletin of Association for Advancement in
Plant Protection(AAPP)
Plant protection Unit, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya
Mohanpur, Nadia, 741252
Published by SHANTANU JHA

সম্পাদক ঃ মনোজ রঞ্জন ঘোষ
নীলাংশু মুখার্জী

মুখ উপদেষ্টা ঃ চিত্রেশ্বর সেন

প্রচ্ছদ ও অলংকরণঃ শঙ্কর ধর

প্রকাশক
শান্তনু ঝা, সচিব
এ্যাসোশিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেন্ট ইন প্ল্যান্ট প্রোটেক্শন, প্লান্ট প্রোটেক্শন ইউনিট,
বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
মোহনপুর, নদীয়া, ৭৪১২৫২

মুদ্রক
কৌশিক দত্ত, লেসার এইড প্রিন্টার্স, বি-৯/১০৭, কল্যাণী, নদীয়া, ৭৪১২৩৫
মোবাইল - ৯৮৭৪৩৬৪৯৮৪

পরিবেশক
এ.এ.পি.পি, প্লান্ট প্রোটেকশন ইউনিট, বিধান চন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মোহনপুর

দাম ঃ ১০ টাকা।

সম্পাদকমণ্ডলী

যুগ্ম সম্পাদক মনোজ রঞ্জন ঘোষ
নীলাংশু মুখার্জী
সচিব শান্তনু ঝা
মুখ্য উপদেষ্টা চিত্রেশ্বর সেন

সদস্য বৃন্দ অমর কুমার সোমচৌধুরি
বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
রতিকান্ত ঘোষ
শ্রীকান্ত দাস
পার্থসারথী নাথ
মতিয়ার রহমান খান
সুজিত কুমার রায়

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ঃ দু-চার কথা ৩

শস্য সুরক্ষায় অগ্রগতি ৪

সুরক্ষার সুপারিশ ৫

ইঁদুর কমানোর পরিবেশবন্ধু পথ ৬

লাল সংকেত ৭

শস্যসুরক্ষার ঃ দেশজঐতিহ্য ৭

ফসলের রোগপোকা ও তার বন্দবস্তঃ

কলা ৮

পেঁয়াজ ১০

ভেন্ডি ১২

ফসল রোগের ডাক্তারি ১৩

নিজে তৈরি করে নেওয়া ওষুধ ১৪

সালফার পুষ্টির অভাবের ব্যধি ১৪

দু-চার কথা

লোকসভার পেট্রোলিয়াম ও কেমিক্যালস স্থায়ী কমিটি, ২০০২ পার্লামেন্টে যে ৩৭তম রিপোর্ট জমা করেছেন তাতে বলেছেন - রোগপোকায় বছরে ৯০ হাজার কোটি টাকার ফসলের ক্ষতি হচ্ছে আজকাল। ঐ ক্ষতিগুলির কোন পূর্বাভাষ পাওয়া যায় না। দেশের কৃষিব্যবস্থার বেশির ভাগটাই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের দায়িত্বে। তাঁদের গরিবি এই কৃষি প্রক্রিয়াকে দূর্বল ও ভঙ্গুর করে রেখেছে। ১৯৫৮ সালে কেরালাতে শতাধিক কৃষক মারা গিয়েছিলেন প্যারাথিয়ন মেশানো গমের রুটি খেয়ে। স্বাধীনদেশে সেই শুরু। ২০০৭ সাল পর্যন্ত অন্ধ্র, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ যত বিপর্যয়, জীবনহানি - সব এই দুর্বলতাই প্রকাশ করছে। তুলোগাছে সবমিলে শ-দেড়েক পোকা দেখা যায়। এর মধ্যে মাত্র ৩০টি ঐ ফসলের শত্রুপোকা। একদিকে নির্বিচারে ওষুধ দিয়ে ঐ দেড়শত পোকার সবই যদি মারা যায় তাহলে যে কোন মুহুর্তে বিপর্যয় আসতে পারে। আবার শুধু বোলওয়ার্ম মারা বিটিতুলো চাষ করে চুপচাপ বসে থাকলেও অন্য পোকা এবং রোগে ফসল নষ্ট হতে পারে। অত্যাধিক রাসায়নিক নির্ভর ভঙ্গুর কৃষি ব্যবস্থায় প্রকৃতিতে পাখি, ব্যাঙ, সাপ, মাছের নানা প্রজাতি শেষ হয়ে যাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এসব রক্ষা করার, রাসায়নিক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার আইন হয়নি।

প্রকৃতিকে যতটা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রেখে কৃষি। নূন্যতম কর্ষণ ও মাঠে মরশুমি ফসলের সঙ্গে বহুবর্ষী ফসল লাগানো। মাঠে ফসল ছাড়া অন্য গাছপালা, পাখি, ব্যাঙ সাপ ইত্যাদি যেন থাকে। ফসলের সবরকমের পুষ্টি জোগানো, বেশি সহনশীল ভ্যারাইটির সমাবেশ, যথাযথ ফাঁকা রেখে চাষ করা। ঠিকঠাক সময়ে ফসল বোনা, প্রয়োজনমত ফল বাগানে ডাল ছাঁটা, রোদ ঢোকানো গেলে সমস্যা সামলানো যায়। প্রথম অবস্থায় মাঠে রোগ পোকা লাগা চিহ্নিত করতে নিয়মিত মাঠের সব ফসল দেখা দরকার। রোগ পোকা লেগেছে আগে জানতে পারলে সব ব্যবস্থাই সফল হয়। সাথী ফসল ঠিকভাবে নির্বাচন করেও রোগপোকা কিছুটা তাড়ানো যায়। আবার মাঠে মরা ব্যাঙ বা কাঁকড়া লাঠির ওপর গেঁথে রাখার দেশজ ভাবনা ও খুব কাজের। গ্রামীন প্রাজ্ঞ মানুষের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে। এভাবে ওষুধহীন শস্যসুরক্ষা বা নো পেস্টিসাইডাল ম্যানেজমেন্ট বা এন পি এম দেশে শুরু হচ্ছে। চাষীর জানা-বোঝাকে আরো সমৃদ্ধ করতে হবে। নিয়মিত মতামত নেওয়া, আলোচনা ও প্রশিক্ষণ দরকার। চাষীর পাঠশালা জাতীয় সান্ধ্যস্কুল এখন খুব দরকার।

নীলাংশু মুখার্জী
মনোজ রঞ্জন ঘোষ
সম্পাদক

শস্য সুরক্ষায় অগ্রগতি ঃ নন পেস্টিসাইডাল ম্যানেজমেন্ট, এন পি এম

আই পি এম আন্দোলনটা পেস্টিসাইড কোম্পানিরা ধরে ফেলে ওর মধ্যে অন্য সব বাদ দিয়ে পেস্টিসাইডই প্রধান করে তুলেছে। উপলব্ধিটা গ্রামের গরীব চাষীদের। যাঁরা ওষুধ কিনতে কিনতে দেউলিয়া হচ্ছেন। কিন্তু শত্রুপোকা বেড়েই চলেছে। অন্ধ্র প্রদেশের খাম্মাম জেলার সীতারামপুর গ্রামের চাষীরা ওষুধ ব্যবহার বন্ধ করেছেন। দশহাজার একর তুলো চাষে কোথাও কোন কীট-রোগনাশক ব্যবহার হচ্ছে না। খাম্মামের মোট চাষের এলাকার ২৫ শতাংশই তুলো। তুলোতে ওষুধ দিলে ওষুধ না দেওয়া মাঠের চেয়ে খুব একটা বেশি ফলন হয় না। বিনা ওষুধে সম্পূর্ণ চাষ বা এন পি এম প্রথম করা হয় ২০০৪ সালে পুনুকুলাগ্রামে। তুলোতে কোন পেস্টিসাইড নয়। এই বার্তা গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছে। বন্ধু পোকারা তুলোকে রক্ষা করবে। অনেক দাম দিয়ে বিটি-তুলোর বীজও কিনতে হবে না। চাষীরা বদলে যে প্রযুক্তিগুলি ব্যবহার করছেন তা নিজেদের অভিজ্ঞতা নির্ভর। আবার আই পি এম থেকে পেস্টিসাইডটা বাদ দিলে যা থাকে তা চাষী পরিবেশ রক্ষার জন্য করছেন তা নয়। আর্থিক সঙ্গতিতে কুলোচ্ছিলনা। সঙ্গে জৈবচাষের অভিজ্ঞতাও কাজে লেগেছে। যেসব ব্যবস্থা সাধারণভাবে নেওয়া হচ্ছে তার মধ্যে পূর্বপরিচিত কিন্তু পেস্টিসাইডের চাপে পরিত্যক্ত আই পি এম এর অ-রাসায়নিক ব্যবস্থাগুলি। গ্রীষ্মে গভীর চাষ ও মাটিকে রোদ খাওয়ানো, বন্ধু পোকার অনুকুল পরিবেশ তৈরি করা, আলোফাঁদ পাতা, ফেরোমোন ফাঁদ বসানো, গোবর-গোচোনা গোলা স্প্রে করা, নিমপাতাসিদ্ধ জল, নিমবীজ, লংকা, রসুন প্রভৃতি জলে ঘোলা বানিয়ে স্প্রে, তুলোর মাঠের আশপাশে গেঁদা বা রেড়ি লাগানো ফাঁদ-ফসল হিসাবে, অড়হড় প্রভৃতি ফসলে লাগা ফলের পোকা গাছ নাড়িয়ে ফেলে দেওয়া, ধানের পোকার জন্য কেরোসিন দড়ি টানা প্রভৃতি অসংখ্য দেশজ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা ছাড়া ফসলের যথাযথ চক্র ঠিক করা, মাটিতে যথেষ্ট জৈবসার দিয়ে ফসলের পুষ্টি অক্ষুন্ন রাখা প্রভৃতিকে সম্বল করেই বিনা ওষুধে সুরক্ষার কাজ সফল ভাবে চলছে অন্ধ্রপ্রদেশের ব্যাপক অঞ্চলে। এন পি এমই আই পি এম-র ফাঁক দিয়ে ঢোকা পেস্টিসাইড ব্যবহার আটকাবে আগামী দিন। মনে রাখতে হবে বিশ্বের বহু দেশে জৈব কৃষির ব্যাপক এলাকাতেও কোন পেস্টিসাইড বা জি এম ভ্যারাইটি ব্যবহার হয় না। ফলন কিন্তু তুলনামূলকভাবে কমেনি।

সূত্র ঃ ডাউন টু আর্থ, ২০০৬, মে, ৩১

সুরক্ষার অগ্রগতি ঃ বায়োহার্বিসাইড ঃ

আগাছা দমনে জীবাণুজনিত বায়োহার্বিসাইড নিয়ে সারা বিশ্বে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। তবে বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদন করার প্রচেষ্টা খুব একটা এগোয়নি। পৃথিবীব্যাপী পরিস্থিতির সমীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা বলছেন এখন পর্যন্ত ১০ র বেশি সাফল্য আসেনি। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করার আগ্রহটা বৈজ্ঞানিক অবস্থা ছাড়াও বিনিয়োগের গুরুত্ব পরিমাপের ব্যাপারও আছে। যেসব বায়োহার্বিসাইড তৈরি হয়েছে তার মধ্যে কোলেটোট্রিকাম গ্লিওস্পোরিঅয়ডিস ছত্রাক দিয়ে তৈরি 'কলেগো' ব্যবহার হচ্ছে ইসকাইনোমিনি ভার্জিনিকার ওপর, ফাইটফথোরা পামিভোরা দিয়ে তৈরি 'ডি-ভাইন' ব্যবহার হচ্ছে মোরেনিয়া ওডোরাটার ওপর, কো. গ্লিওস্পোরিঅয়ডিস দিয়ে তৈরি 'বায়োমাল' ব্যবহার হচ্ছে মালভ পুসিলার ওপর, আর একটি কো. গ্লিওস্পোরিআয়ডিস দিয়ে তৈরি লুবোয়া-২ ব্যবহার হচ্ছে স্বর্ণলতার ওপর এবং জ্যান্থোমোনাস ক্যামপেসট্রিস-পোই দিয়ে তৈরি ক্যাম্পেরিকো ব্যবহার হচ্ছে পোয়া অ্যানুয়ার ওপর। সব মিলে আগাছা দমনের পথে এই অগ্রগতি উজ্বল ভবিষ্যৎ দেখাচ্ছে।

সূত্র. ন্যাসানাল রিসার্চ সেন্টার ফর উইড সায়েন্স, জব্বলপুর।

সুরক্ষার সুপারিশ ঃ

● পালামপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, হিমাচলপ্রদেশ থেকে **ফ্রেঞ্চবিনের রোগের জন্য একটি সুপারিশ** পাওয়া গেছে। বিন বা **ফ্রেঞ্চবিনের সাদাপচা** (স্কলেরোটিনিয়া স্কেলেরোটিওরাম) এবং **মাকড়সা জাল ঝলসানো** (রাইজকটনিয়া সোলানি) রোগদুটি মারাত্মক। বিশেষত আগস্ট মাসে বেশ সমস্যা করে। কয়েক বছর ধরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা গেছে যে কার্বেন্ডাজিম ওষুধে বীজ শোধন (২.৫ গ্রাম প্রতি কেজি বীজে) এবং ১.০ বার ফসলে কার্বেন্ডাজিম (১ গ্রাম" লিটারজলে) স্প্রে করলে দুটি রোগই নিরাময় হয়। জৈব চাষ করতে হলে ট্রাইকোডার্মা ব্যবহার করতে হবে এবং এক্ষেত্রে বীজের চেয়ে মাটিতে ট্রাইকোডার্মা প্রয়োগেই সবচেয়ে ভালো ফল হয়েছে। তবে দুটি পদ্ধতি সুসমন্বিত ভাবে

ফ্রেঞ্চবিনের সাদাপচা রোগ

রাইজকটনিয়া জনিত ঝলসানো রোগ

প্রয়োগ করলে অর্থাৎ কার্বেন্ডাজিম দিয়ে বীজশোধন, ফসলে ফুল আসার সময় ০.০৫% হারে স্প্রে করে রোগ মুক্ত করা সম্ভব। অধিকন্তু মাটিতে হেক্টর প্রতি ২.৫ কেজি ট্রাইকোডার্মা ও ৬২ কেজি খামারসারের মিশ্রণ দুটি রোগকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

সূত্র ঃ বানিয়াল ও সিং, ২০০৭.

● **বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারি পোকার** আক্রমণ গ্রীষ্মকালীন বেগুনের একটি প্রকৃত সমস্যা। চাষীরা নানা কীটনাশক স্প্রে করেন। ফল পান না। ভেষজ কীটনাশক পাইরেথ্রিনের মত বলে সিনথেটিক পাইরিথ্রয়েড বা বাজারে পাওয়া রিপকর্ড, অ্যামবুস, ডেসিস ইত্যাদি ব্যপক ব্যবহার করেন অথবা কার্বামেট জাতীয় যেমন সেভিন ব্যবহার করেন। এরা মাকড় দমন করতে পারে না। কিন্তু মাকড়ের খাদক যে পোকা ফসলের বন্ধুপোকা তাদের মেরে ফেলে। ফলে বেগুন প্রভৃতি সবজিতে লালমাকড় ব্যপক ভাবে বেড়ে যায়। চাষী ফলন অনেক কম পান। তাই বেগুনের ডাঁটা ও ফল ছিদ্রকারি পোকার আক্রমণ কমানোর জন্য ফেরোমোন ফাঁদ পাতার কথা বলা হচ্ছে। ফেরোমোন পোকার যৌন আকর্ষক হরমোন। মাঠে এলাকা হিসাব করে ঠিক সংখ্যায় ফেরোমোন ফাঁদ বসালে ঐ পোকার পুরুষ মথ ব্যাপকভাবে ফাঁদে পড়বে। ফলে স্ত্রী পোকা নিষিক্ত হবে না। অপুষ্ট ডিম পাড়বে। সব মিলে মাঠে ঐ পোকার সংখ্যা অনেক কমে যাবে এবং বেগুনের ক্ষতিও কমবে। তবে ফেরোমোন ফাঁদ বসাতে হলে আশপাশের সব বেগুনচাষী মিলে এলাকার প্রয়োজন মত সংখ্যায় ফাঁদ বসাতে হবে। পরিবেশ দূষণ হবে না। সুরক্ষার খরচও অনেক কম হবে।

বেগুনের ডগা ও ফল ছিদ্রকারি পোকা

পোকা ধরার ফেরোমোন ফাঁদ

● **বাদাম** ফসলটির চাষ ইদানীং পশ্চিমবঙ্গে বাড়ছে। অনেকগুলি রোগ পোকার উপদ্রব হয় বাদামে। **জাবপোকা** লাগে, ঠান্ডা থাকলে বাড়ে। গোড়ার দিকে খরা থাকলে অবশ্য থ্রিপস বেশি লাগে, দীর্ঘ শুখা কাটার পর হঠাৎ বৃষ্টি হলে লাল **শুঁয়াপোকার** উপদ্রব বেশি। বৃষ্টি হয়ে যাবার পর মাটি থেকে বিটল উঠে

আসে। সন্ধ্যা ৭-৮টা নাগাদ বেশি বের হয়। আবহাওয়া বেশি আর্দ্র হলে, শিশির পড়লে এবং নাইট্রোজেন ও ফসফরাস সার বেশি পড়লে , মাটিতে ম্যাগনেসিয়াম কম হলে পাতার ছোটবড় দুটি টিকা দাগই বাড়ে। কুঁড়ি শুকানো বা বাড নেক্রোসিস ভাইরাসের বাহক (থ্রিপস পামি) বহুফসলে লাগে বলে থেকেই যায়। এছাড়াও টোব্যাকো স্ট্রিক ভাইরাস বাদাম এবং অন্য অনেক ফসলে দেখা যায়। মোটামুটি বাদামের এই রোগপোকার পরিস্থিতিতে যে সুপারিশ ন্যাসানাল সেন্টার ফর ইনটিগ্রেটেড পেস্ট ম্যানেজমেন্ট করেছে তা নিম্নরূপ।

বাদামের জাবপোকা

বাদামের শুঁয়াপোকা

মাটিবাহিত পোকা ও আগাছা কমানোর জন্য গ্রীষ্মে গভীরভাবে চাষ দিতে হবে মাঠে। ফ্লোক্লোরালিন প্রয়োগ করতে হবে হেক্টরে ১.৫ কেজি এ আই হিসাবে। সাত ভাগ বাদামের সাথে ১ ভাগ অড়হড় লাগাতে হবে। সীমানাতে ৪ লাইন কিছু মিলেট লাগাতে হবে। পাখি বসে যাতে। চারা বেরোলে ৩০ দিনে একবার আগাছা নিড়তে হবে। মাটিতে সাদা গ্রাব থাকলে প্রতিকেজি বীজে ৬ মি.লি. ক্লোরোপাইরিফস ২০ ই সি দিয়ে শোধন হবে। মাঠে আগের বছর গোড়াপচার সমস্যা থাকলে প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম ম্যানকোজেব দিয়ে শোধন করতে হবে। ফুল আসার সময় লাল শুঁয়াপোকা লাগতে পরে। মাঠের চারপাশে ঘিরে নালা কেটে সেখানে মিথাইল পারাথিয়ন ছড়ানো যায় হেক্টরে ৫ কেজি হিসাবে। যখন শুঁটি ধরবে কার্বেন্ডাজিম (০.১%) ও ম্যানকোজেব(০.২%) মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। প্রয়োজন হলে কুইনালফস ২৫ ইসি লিটারে ২ মি লি গুলে স্প্রে করা যায়। তাতে টিকা দাগ, ডাঁটাপচা এবং পাতাকুরে খাওয়া পোকা কমবে।

ইঁদুর কমানোর পরিবেশ-বন্ধু পথ ঃ বাংলাদেশে কুমিল্লার কয়েকটি গ্রামের অভিজ্ঞতা। ইঁদুর কমানোর জন্য শুধু যে ফসলের উৎপাদন বাড়ে তাই নয় মানুষের বেশ কিছু রোগ ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনাও কমে । ওসব অঞ্চলেও ৫-১০% গুদামজাত ধান নষ্ট করে ইঁদুর প্রতি ৩ মাস গুদাম জীবনে। প্রতি কৃষক পরিবারও বছরে ২০০ কেজির মত ধান হারায় এভাবে। সেচ প্রাপ্ত বা অসেচ এলাকাতে ৫-১৭% ধান নষ্ট হয়েছে মাঠে। চাষীরা প্রায় ইঁদুরে ধান নষ্ট অবধারিত ধরে নিয়ে প্রতি ৮ লাইন ধান ফসলের জন্য আরো ২ লাইন ধান লাগান। বাংলাদেশের চাষীরা ইঁদুর দমনের ওষুধও ব্যবহার করেন। কিন্তু সবমিলিয়ে প্রয়োগের পথে অনেক ভুল হবার কারণে লাভ হয়না খুব একটা। বিষ প্রয়োগ, ফাঁদ ব্যবহার , পরিবেশবন্ধু এবং টেকসই কার্যকর ব্যবস্থা একটা অঞ্চলের সব কৃষককে সামিল করতে না পারার কারণে এই অসাফল্য। এরকম অবস্থাতে কুমিল্লাতে যে অভিযান হল ইকলজিক্যালি বেসড ম্যানেজমেন্ট বা ইবি আর এম তা মুখ্যত এরকম। এই ব্যবস্থায় প্রথম ধাপে জানতে হবে কোথায়, কি ধরনের ইঁদুর সমস্যা করছে। গেছো, মেঠো বা ঘরের ইঁদুর। তাদের প্রকৃতি কেমন। স্থানীয় মানুষ এদের কিভাবে জানেন। এদের অভ্যাস সম্পর্কে তাঁদের ধারণা। পরিকল্পনাটা রচনা করতে হবে এবং প্রয়োগের ধাপগুলোও। একটা অঞ্চলজুড়ে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যথাযথ সংগঠন ও পরিচালন ব্যবস্থা দরকার। সমস্ত অঞ্চলের মানুষের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরমধ্যে নিয়মিত অন্তত ৫০% বাড়িতে রোজ ফাঁদ বসানো; আজ এবাড়ি কাল পাশের বাড়ি ২-৩ মাস চলতে পারে। ছোটখাট কৃষিক্ষেত্রে ট্রাপ ব্যারিয়ার সিস্টেম বা একটি ছোট মাঠে আকর্ষক ফসল লাগিয়ে ইঁদুর আটকানো জালে ঘেরা। পরিবেশ এভাবে নিয়ন্ত্রন করতে হবে যাতে ইঁদুরের কাছে খাবার ও জল দুষ্প্রাপ্য হয়, ওয়ারাফারিন এর মত ওষুধ ব্যবহার করা যাতে কিছুদিন ধরে ঐ ওষুধ খেয়ে ইঁদুর গোষ্ঠীর রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা দেখা দেবে। সর্বপোরি অঞ্চলের কৃষক পরিবারগুলির সমগ্র পরিকল্পনাটা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা এবং ব্যাপক অংশগ্রহণ থাকলেই এ অভিযান সফল হবে। সূত্র ঃ লিসা ইন্ডিয়া, ২০০৭ ডিসেম্বর।

ইঁদুর ধরার ফাঁদ - একটি পরিবেশ-বন্ধু পথ

লালসংকেত

গমের কালো মর্চে রোগের জীবাণু ছত্রাক পাকসিনিয়া গ্রামিনিস এর একটি ভয়ঙ্কর বর্ণ তৈরি হয়েছে। ইউ. জি -৯৯। উগান্ডাতে প্রথম দেখা যায় ১৯৯৯ তে। এরপর পূর্ব আফ্রিকার দেশগুলি যেমন কেনিয়া ইথিওপিয়াতে গমক্ষেত ছেয়ে গেছে এই জীবাণুতে। গত বছর ২০০৭ এ দেখা গেছে ইয়েমেনে। দ্রুত ছড়াচ্ছে। বিজ্ঞানীরা ভেবেছিলেন যে স্বাভাবিক বায়ুপ্রবাহে ভর করে ছত্রাকটির স্পোরগুলি আফ্রিকা থেকে ধীরে ধীরে মিশর, তুর্কি, সিরিয়া প্রভৃতি দেশে পৌঁছাবে। কিন্তু ক্রান্তীয় ঝড় 'গনু' ২০০৭ জুন মাসে ধেয়ে এল আরব উপদ্বীপ অঞ্চলে। সব হিসাব উল্টে গেল। রোগজীবাণু ছত্রাকটি অনেক আগে পৌঁছে গেল ইরানে। সমস্যা হচ্ছে ভারত ভূখন্ডে পৌঁছাতে মাঝে শুধু পাকিস্তান। পাকিস্তান আবার গমের উপর অত্যন্ত বেশি নির্ভরশীল এবং পাকিস্তানই ঐ ভয়ঙ্কর জীবাণুর রুটি উৎপাদন ক্ষেত্রে ঢোকার রাস্তা। বিজ্ঞানীরা বলছেন - ঐ সবদেশে যথেষ্ট রোগনাশক ছড়িয়ে ছত্রাকটির গতি কিছুটা থামানো সম্ভব। ঐ পথে চাষীরা যাতে গম না লাগায় সেটাও চেষ্টা করা যায়।

গমের কালো মর্চে রোগ

তাহলেও ঐ পথে রোগ আসা বিলম্বিত হতে পারে। পৃথিবীর সবরকম চালু গমের ভ্যারাইটিগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ৩টি জিন রয়েছে ভ্যারাইটিগুলিকে মরচে সহনশীল বা প্রতিরোধী করতে। নতুন সৃষ্টি হওয়া মরচে জীবাণুর ইউ জি-৯৯ বর্ণটি ঐ তিনটি জিনের সহনশীলতাও সম্পূর্ণ অতিক্রম করে ঐ সহনশীলতাকে অকেজো করে দিয়েছে। এটাই দুশ্চিন্তার মূল জায়গা। বিজ্ঞানীরা নতুন ভ্যারাইটি তৈরিতে নেমে পড়েছেন। কিন্তু ৫-৬ বছর তো লাগবেই।

শস্য সুরক্ষার দেশজ ঐতিহ্য ঃ

যোধপুরের সেন্ট্রাল এরিড জোন রিসার্চ ইনস্টিট্যুট থেকে তথ্য পাওয়া গেছে। প্রসপিস জুলিফ্লোরা এবং ক্যাসিয়া আরিকুলাটা গাছের ছাল জলে থেঁতো করে সেই নির্যাস লঙ্কা ফসলে স্প্রে করে লঙ্কার পাতা কোঁচকানো, সাদা গুঁড়া এবং পাতায় দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

একটা গর্ততে আইপোমিয়া বাইলোবা এবং ক্যালোট্রপিস এর পাতা এবং লেপটাডিনিয়ার কান্ড কুচিয়ে সঙ্গে

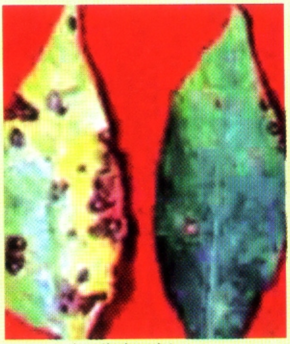

লঙ্কার পাতায় দাগ

লঙ্কার পাতা কোঁচকানো

লঙ্কার সাদা গুঁড়া

ছাই, লবণ, প্রাণীর মল ও চোনা এবং পাখীর বিষ্ঠাও দিয়ে পচানো হয় ২-৩ মাস। এরপর এটা জলে গুলে পেঁয়াজ লঙ্কা ও রসুন ফসলে স্প্রে করে ফসলের রোগ পোকা কমানো হয়।

বার্মার জেলাতে জিরা ও ইসবগুল চাষ হয় রবি মরশুমে। জিরার ঢলে পড়া রোগ (ফুসেরিয়াম) বিরাট সমস্যা। বর্ষা মরশুমে বাজরা লাগালে রবিতে ঐ মাঠে জিরা চাষে ঢলে পড়ারোগ হয়না।

(সূত্র ঃ অরুণকুমার, সেন্ট্রাল এরিড জোন রিসার্চ ইন্সটিট্যুট যোধপুর।)

ফসলের রোগ পোকা ও তার বন্দোবস্ত ঃ

● **কলার কীটশত্রু ঃ**

১. এঁটের কেড়ি পোকা ঃ কেড়ি পোকার ধাড়ির মাথা সামনের দিকে ক্রমে সরু ও লম্বা হয়। ডগায় থাকে মুখাংশগুলি। শুঁড়ের মতো মাথাটার উপরে দুপাশে একটি করে চোখ ও হাঁটুর মতো ভাঁজ খাওয়া শুঁড় থাকে। পোকা লম্বায় দেড় সেমি। পিঠটা ঢাকা থাকে শক্ত খোলকের মতো প্রথম জোড়া পাখা দিয়ে। এই পাখায় লম্বালম্বি বেশ কয়েকটি খাঁজ এবং রঙ চকচকে কালো।

এঁটের কেড়ি পোকা ও আক্রান্ত কান্ড

পোকা গ্রীস্মের সুরু থেকে শীত পড়ার আগে পর্যন্ত বেশি সক্রিয়। গাছের গোড়ায় বা এঁটেতে স্ত্রী পোকা শুঁড় দিয়ে গর্ত করে একটি করে ডিম পেড়ে দেয় সারা বছরই। বাকিগুলি সন্ধ্যার পর সাধারণতঃ কান্ডে বা এঁটেতে ছেঁদা করে খায় ও ভিতরে ঢুকে যায়। এঁটে পচে যাওয়া গাছের অংশ সুড়ঙ্গের জালে পরিণত হয়। ছোট গাছ আর বাড়ে না। পাতা প্রথমে হলুদ হয়ে শুকিয়ে যায়। পরে গাছ মরে যায়।

কান্ডের কেড়ি পোকা (ওডোইপোরাস) পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে পুরানো বাগিচার ক্ষতি করে। ধাড়ি এঁটে কেড়ি পোকার মতো। একটু বড় আর লালচে বাদামি। তবে স্ত্রী পোকা কান্ডের ও পাতার গোড়ায় শুঁড়ের মাথার মুখ দিয়ে ছেঁদা করে। ভিতরে ডিম পেড়ে দেয়। একটি ছেঁদায় একটি করেই ডিম। ডিম থেকে পা হীন কোঁচকানো হলদেটে সাদা শরীর ও কালচে বাদামি মাথা কীড়া বেরোয়। সুড়ঙ্গ করে খেয়ে এঁটের ভিতর ঢোকে। ধাড়িগুলি কান্ডের ভিতরেই সুড়ঙ্গ করে খায়। থোড় একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। গাছ দুর্বল হয়ে মরে যায়। কলার ছড়া পড়লেও পুষ্ট হয় না।

দুটি কেড়ি পোকার আক্রমণ কমাতে ● সুস্থ চারা গর্তে নিমখোল বা কীট নাশক দিয়ে বসাতে হবে। ● পুরানো আক্রান্ত গাছ তুলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ● ঝাড়ে একটি বা দুটি চারার বেশি নয়। ● এন্ডোসালফান -৩৫ লিটারে দু মিলি বা কার্বারিল গুঁড়ো লিটারে দুগ্রাম জলে মিশিয়ে গোড়ার দিকে স্প্রে করতে হবে। ● ডিডিভিপি ১ মিলি প্রতি লিটারে মিশিয়ে কান্ডে ইনজেকশান দিতে হবে।

গুবরে পোকা ও আক্রান্ত পাতা ও ফল

২. ফল-পাতা চেঁছে খাওয়া গুবরে পোকা (নোডোস টোমা)ঃ ছোট বাদামি রঙের মটর ডালের মাপের ও আকৃতির গুবরে পোকা ধাড়ি অবস্থাতে কচি পাতা ফল ও পাতা আঁকা বাঁকা রেখায় চেঁছে খায়। ফলে পাতা ও ফলের উপরে বাদামি রঙের দাগ পড়ে। ফলনের বিশেষ ক্ষতি না হলেও এতে কলার বাজার দর কমে। সাধারণতঃ বর্ষাকালেই দেখা যায়। ডিম থেকে পুত্তলি মাটিতেই থাকে। বিভিন্ন আগাছার শিকড় খেয়ে বাড়ে। ক্ষেত আগাছামুক্ত ও পরিস্কার রাখলে পোকার উপদ্রব কম হবে। অ্যাসিফেট ১ গ্রাম প্রতি লিটারে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

৩. বাদামি জাব পোকা(পেন্টালোনিয়া) ঃ এই বাদামি রঙের ছোট জাব পোকার ডানাহীন ধাড়ি প্রায় ৩.০ মিমি। ছোট ছোট দলে পাকানো মাঝপাতার আধখোলা পাতার নীচে বা পাতার কান্ডে জড়ানো আলগা খোলার ভিতর থাকে।

এদের আক্রমণে সরাসরি ক্ষতি তেমন হয় না। তবে মারাত্মক ক্ষতি করে গুচ্ছ পাতা (বাঞ্চি টপ) রোগ ছড়িয়ে। পোকারা সহজে নজরে পড়েনা। রোগ বৃদ্ধি কমাতে আক্রান্ত গাছ সমুলে তুলে পুড়িয়ে ফেলতে

হবে। আশেপাশের ঝাড়ে মিথাইল ডেমেটন লিটারে এক মিলি মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

● কলার প্রধান রোগ

বাণিজ্যিক ভাবে কলা চাষ করতে যে সমস্ত বাধা আসে রোগের আক্রমণ তার মধ্যে অন্যতম। কিছু কিছু রোগ ফসলের মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে এবং যার মাত্রা ৫০-৭০ শতাংশ। এমনকি সঠিক পরিচর্যা না করতে পারলে শতকরা ১০০ ভাগ পর্যন্ত ক্ষতি হতে পারে। বিভিন্ন রোগের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে যে রোগগুলো কলার বিশেষ ক্ষতি করে সেগুলি হল সিগাটোকা, পানামা এবং গুচ্ছমাথা।

১. সিগাটোকা বা পাতায় দাগ ঃ এই রোগের আক্রমণে প্রথমে গাছের সবুজ পাতায় কালচে, বাদামি বা ধুসর রঙের লম্বা লম্বা দাগ দেখা যায় যেগুলো ক্রমশঃ বড় হতে থাকে এবং পাতার একটা বড় অংশে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত পাতা ধীরে ধীরে শুকিয়ে যায় এবং গাছের উপকান্ডের চারপাশে ঝুলে থাকে। অপরিণত পাতা মরে যাবার ফলে গাছের পাতার সংখ্যা কমে আসে এবং গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। ছোট কাঁদি হয় এবং ফল বাজারজাত করা যায় না। বায়ুবাহিত ছত্রাক জীবাণু দ্বারা এই রোগ খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং বর্ষাকালে এর তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বর্ষার শুরুতে এই রোগের লক্ষণ দেখতে পেলেই লিটার প্রতি ১ মিলি হারে প্রোপিকোনাজল জাতীয় ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনভিত্তিক তিন থেকে চার সপ্তাহ পর পর ৩-৪ বার স্প্রে করলে এই রোগ সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই সঙ্গে বাগানের চারপাশের আগাছা এবং রোগগ্রস্থ পাতা ছেঁটে ফেলে পরিস্কার করে রাখতে হবে।

কলার সিগাটোকা বা পাতায় দাগ

২. পানামা রোগ বা ছত্রাকঘটিত ঢলে পড়া রোগ ঃ গাছের সবুজ পাতা ধার থেকে আস্তে আস্তে হলুদ হতে থাকে। প্রথমে একটা বা দুটো, পরে সমস্ত পাতা হলুদ হয়ে যায় এবং ঝুলে পড়ে। অনেক সময় গাছের উপকান্ড লম্বালম্বিভাবে ফেটে যায়। আক্রান্ত গাছের উপকান্ডটি চিরে ফেললে বাদামি রঙের লম্বা লম্বা দাগ দেখা যায়। কন্দের মধ্যেও এই কালচে বাদামি দাগ দেখতে পাওয়া যায়। মাটিবাহিত ছত্রাক জীবাণু এই রোগের কারণ। শিকড়ের মাধ্যমে কন্দ এবং উপকান্ডে পৌঁছে গিয়ে গাছে খাদ্যরস চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। নীরোগ বাগান থেকে তেউড় নির্বাচন, রোপনের আগে কার্বেন্ডাজিম জাতীয় ঔষধে তেউড় চারা শোধন, প্রাথমিক অবস্থায় আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করে দেওয়া, রোগ সহনশীল জাত নির্বাচন করা, পরিমিত এবং নিয়ন্ত্রিত সেচ দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে এই রোগের প্রকোপ কমানো যেতে পারে।

কলার পানামা রোগ

৩. বানচি টপ বা গুচ্ছ মাথা রোগ ঃ রোগাক্রান্ত গাছ বামনাকার হয়ে থাকে এবং ডগা থেকে ছোট ছোট পাতা গুচ্ছাকারে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। পাতাগুলো ছোট, সরু এবং খাড়া ভাবে সাজানো থাকে। সাধারণত আক্রান্ত গাছের বৃদ্ধি ১-২ ফুটের মধ্যে থাকে এবং কাঁদি আসে না। ঝাড়ে একটা গাছ আক্রান্ত হলে তা ধীরে ধীরে অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। মাইকোপ্লাসমা জনিত এই রোগ কলার জাব পোকার দ্বারা বাহিত হয়ে সহজেই বাগানের অন্য গাছে ছড়িয়ে পড়ে। নীরোগ বাগান

থেকে তেউড় সংগ্রহ করতে হবে। বাগানে রোগের লক্ষণ দেখা মাত্র আক্রান্ত গাছ তুলে নষ্ট করে দিলে নতুন

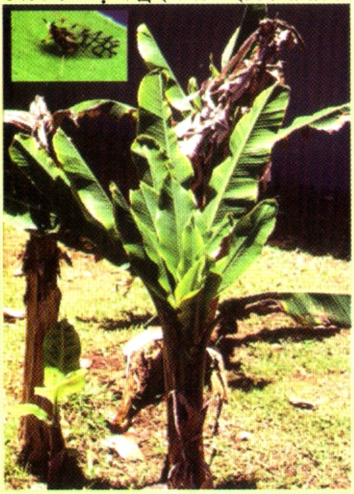

কলার গুচ্ছ মাথা রোগ

গাছে আক্রমণের সম্ভাবনা কমে যায়। জাব পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

(সূত্র ঃ ডঃ দিলীপ কুমার মিশ্র বিধানচন্দ্র কৃষিবিশ্ববিদ্যালয়।)

৪. কলার কন্দ পচা রোগ ঃ কন্দ বা এঁটে পচা কলার একটি ব্যাকটেরিয়া ঘটিত রোগ। বানিজ্যিক ভাবে চাষ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে এই রোগের প্রকোপ এ রাজ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে টিস্যু কালচার চারা (গবেষণাগারে কৃত্তিম ভাবে তৈরী চারা) ব্যবহারের ফলে রোগ দ্রুত ছড়াচ্ছে। হালকা হলদে পাতা এবং দুর্বল, গাছ যার বৃদ্ধি কমে আসে। ক্রমে নীচের দিকের পাতা শুকোতে শুরু করে। আক্রান্ত গাছের মাটির নীচের অংশ পচে যায়, ফলে অল্প আয়াসে উপকান্ডটি উঠে আসে। কখনো কখনো গাছটি মাটির সংযোগস্থল থেকে ভেঙ্গে পড়ে অথবা ঐ অংশের উপকান্ডটি ফেটে যায়। পচা অংশ থেকে আলু পচার মতো দুর্গন্ধ বেরোয়।

কলার কন্দ পচা রোগ

সম্মিলিত ভাবে কিছু প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে কন্দ পচা রোগ অনেকাংশে কমানো যায়। এগুলি হলো নীরোগ চারার ব্যবহার, মাটিতে জলের নিয়ন্ত্রন করা, পরিমিত সেচ দেওয়া, গভীর গর্তে রোপন না করা, প্রচুর পরিমানে জৈব সার প্রয়োগ করা। আক্রান্ত গাছ দেখা মাত্র বাগান থেকে তুলে নষ্ট করে দেওয়া এবং সেই জায়গায় ব্লিচিং পাউডার ব্যবহার করা।

● পেঁয়াজের কীট সমস্যা ও সমাধান ঃ

পেঁয়াজ শীতকালের অন্যতম অর্থকরী ফসল। হুগলি জেলার বলাগড় ও জিরাটের বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে পেঁয়াজ চাষ হয়ে থাকে। বিভিন্ন পোকামাকড়ের আক্রমণে পেঁয়াজের উৎপাদন হ্রাসপ্রাপ্ত হলেও পেঁয়াজের থ্রিপস ফসলের সাংঘাতিক ক্ষতি করে। শত শত থ্রিপস দলবদ্ধ ভাবে পেঁয়াজের পাতা থেকে রস শোষণ করে। আক্রান্ত গাছ সাদা ও বিবর্ণ হয়ে মরে যায়। শীতের শেষে গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এদের আক্রমণের তীব্রতা ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়।

পেঁয়াজের থ্রিপস পোকা ও আক্রান্ত পাতা

প্রতিকার ঃ প্রথম দিকে আক্রমণের লক্ষণ দেখা মাত্র নিম জাতীয় ঔষধ যেমন, এজাডারিকটিন ১ শতাংশ এক মিলি প্রতিলিটার জলে গুলে প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজন হলে এসিটামিপরিড এক গ্রাম চার লিটার জলে বা ডাইয়াফেনথিউরণ এক গ্রাম দুই লিটার জলে গুলে প্রয়োগ করতে হবে।

(সূত্র ঃ কৃষ্ণ কর্মকার, বিসিকেভি, কল্যাণী)।

● পেঁয়াজের রোগ ও তার দমন ব্যবস্থা ঃ

পেঁয়াজ ফসলটি বেশ কয়েকটি রোগে আক্রান্ত হয়। এদের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষতিকারক রোগ হল

১. বেগুনি ঝলসারোগ ঃ অলটারনেরিয়া পোরি ছত্রাক রোগের কারণ। বেগুনি ঝলসানো ছোপগুলি হয় পাতার ওপর লম্বাটে বা ডিমের আকৃতির। শীতের শেষে এ রোগের প্রকোপ বাড়ে। একাধিক ঝলসা ছোপ ধরার

ফলে আক্রান্ত পাতাগুলি ডগা থেকে শুকিয়ে ভেঙ্গে বা ঝুলে পড়ে। এতে পেঁয়াজ উৎপাদন অত্যধিক কমে যায়। যেসব অঞ্চলে বীজ উৎপাদনের শস্য চাষ হয় সেখানে এই রোগ বীজ উৎপাদন ভীষণভাবে ব্যহত করে। রোগটির অপেক্ষাকৃত ছোট মাপের ঝলসাদাগ ফুলের ডাঁটি বা কলিটিতেও দেখা যায়। যার ফলেও বীজ উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

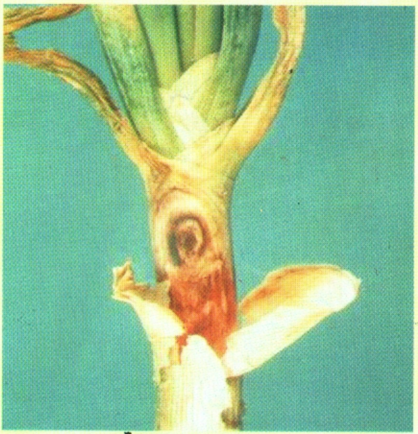

পেঁয়াজের ঝলসা রোগ

রোগটির নিয়ন্ত্রণে সবচেয়ে কার্যকরী রিডোমিল এম জেড। ০.২৫% হারে ৩-বার স্প্রে করে রোগদমন করা গেছে। এছাড়াও হেক্সাকনাজোল, মানকোজেব ও ব্যবহার করা যায়।

২. পেঁয়াজপচা - যা পেঁয়াজ তোলার পর বাজারে গুদামে ভীষণভাবে বাড়ে এবং ছড়ায়। রোগজীবাণুটি অ্যাসপারজিলাস নাইজার। পেঁয়াজের বালবগুলির যে খোসার স্তর থাকে তার মধ্যে মধ্যে ছত্রাকটি বেড়ে ওঠে। প্রথমে উপরিস্তরে থাকলেও সময়ের সাথে সাথে পরিমানে বেড়ে উপরিস্তর বিবর্ণ এবং বিস্বাদ করে তোলে। পেঁয়াজ বাজারে বিক্রির অযোগ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে পেঁয়াজ তোলার সময় থেকে পরিচ্ছন্নতা ও সাবধানতার প্রয়োজন। তোলার সময় পেঁয়াজ গাছের আশপাশ পরিস্কার থাকা, পেঁয়াজে আঘাতজনিত সমস্যা না থাকা এবং পেঁয়াজ গুদামজাত করার সময় যথাযথ প্যাকিং ও সংরক্ষণ দরকার।

অ্যাসপারজিলাস জনিত পিঁয়াজ পচা

৩. গোড়া ও কন্দ পচা ঃ রোগের কারণ ছত্রাকটি ফুসেরিয়াম অক্সিস্পোরিয়াম। গাছ একটু বড় হলে কন্দ তৈরি হবার পরপরই গোড়ায় পচন ধরে। যে জমিতে দীর্ঘদিন একটানা পেঁয়াজ চাষ হচ্ছে সেখানে রোগের প্রকোপ বেশি। গোড়ার (তলার) পাতা শুকিয়ে ঝুলে পড়লে বোঝা যায়। পাতার গোড়ায় সাদা ছাতা চোখে পড়ে। শিকড় পচে যায়। গোড়া খুঁড়লে রস গড়াতে দেখা যায়। কন্দ ধীরে ধীরে পচে। গোড়ায় জলে গোলা ওষুধ (বেনোমিল ০.১%) ঢেলে দেওয়া যায়। তামাঘটিত ওষুধও দেওয়া যায়। সবচেয়ে ভালো দু-তিন বছর ঐ জমিতে পেঁয়াজ চাষ বন্ধ রাখা।

পেঁয়াজের গোড়া ও কন্দ পচা

৪. পেঁয়াজের ধ্বসারোগ ঃ পেঁয়াজের স্টেমফাইলিয়াম জনিত ধ্বসা রোগের আক্রমণের ফলে পেঁয়াজের পাতা বা কলিতে হলুদ বা হাল্কা কমলা রঙের দাগ দেখা যায় এবং অনুকূল আবহাওয়ায় পাতা বা কলি ডগা থেকে শুকিয়ে যায়।

প্রতিকার - এই রোগের প্রকোপ দেখা দিলে রাসায়নিক কৃষি বিষ যেমন ম্যানকোজেব (২.৫ গ্রাম"লিটার) বা ক্লোরোথ্যালোনিল (২.০ গ্রাম"লিটার) বা ডাইফেনকোনাজোল (০.৫ মিলি"লিটার) বা প্রোপিকোনাজোল (১.০ মিলি"লিটার) ১০-১৫ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে। স্প্রে মিশ্রণের সাথে অবশ্যই আঠা মেশাতে হবে।

সূত্র ঃ সুব্রত দত্ত ও সুজিত কুমার রায়, বিসিকেভি, কল্যাণী

ভেন্ডির পোকামাকড় ও প্রতিকার

গ্রীষ্মকালীন সব্জির মধ্যে ভেন্ডি অন্যতম। গাঙ্গেয় সমভুমির সর্বত্র সমগ্র গরমকালেই অর্থকরী সব্জি হিসাবে এর চাষ হয়ে থাকে। বীজ বোনার অল্প দিনের মধ্যেই ভেন্ডির উৎপাদন শুরু হয় বলে কৃষক মহলে এর যথেষ্ট কদর আছে। বর্তমানে উন্নত এবং সংকর জাতের অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ভেন্ডির উৎপাদন প্রায় সারা বছরই হয়ে থাকে। স্বল্প সময়ে এর উৎপাদন শুরু হলেও বিভিন্ন রোগ ও মাকড়ের আক্রমণের ফলে এর উৎপাদন ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

ভেন্ডির ফল ও ডগাছিদ্রকারী পোকা

ফল ও ডগাছিদ্রকারী পোকা গাছের কুঁড়ি অবস্থা থেকে আক্রমণ শুরু করে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে। এছাড়া **শোষক পোকামাকড়** যেমন, জাসিড বা হপার, থ্রিপস বা চিরুনিপোকা, হোয়াইট ফ্লাই বা সাদামাছি এবং লাল মাকড়ের আক্রমণে ভেন্ডির উৎপাদন যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ডগা ও ফলছিদ্রকারী ল্যাদা পোকা গাছের ডগা এবং বর্ধনশীল ফলের মধ্যে ঢুকে খায়। এর ফলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যহত হয় এবং ফল খাওয়ার ও বাজারজাত করার অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে।

ভেন্ডির মাকড় ও আক্রান্ত পাতা

প্রাথমিক অবস্থায় ডগা ও ফলছিদ্রকারী পোকার সামান্য আক্রমণ লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে পরিচর্যা ও যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এদের নিধন করতে পারলে পরবর্তী সময়ে ফসল উৎপাদনের চরম অবস্থায় আক্রমণ যথেষ্ট সীমিত থাকতে পারে।

আক্রমণ লক্ষ্য করার সঙ্গে সঙ্গে নিম জাতীয় ঔষধ যেমন অ্যাজাডাইরেক্টিন ১% ১.০ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে সপ্তাহ অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। আক্রমণের ব্যপকতা লক্ষ্য করে রাসায়নিক কীটনাশক যেমন, স্পিনোসাড ১.০ মিলি প্রতি ১০ লিটার জলে গুলে ১০-১৫ দিন অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। কীটনাশক প্রয়োগ করার আগে সমস্ত ফল তুলে ফেলতে হবে ও প্রয়োগের পর নির্দিষ্ট দিন অপেক্ষা করে পরবর্তী ফল তুলতে হবে।

ভেন্ডির জ্যাসিড ও আক্রান্ত পাতা

শীতের শেষে গরম পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিন্ডিতে জ্যাসিড, থ্রিপস, সাদামাছি ও লালমাকড়ের আক্রমণ ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে, এদের আক্রমণে গাছ ঝলসে যায়। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বন্ধুপোকার যেমন উপকারী প্যারাসাইট ও প্রিডেটরের সংরক্ষণ ও গবেষণাগারে উৎপাদন করে আক্রান্ত জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। নিম জাতীয় ঔষধের ব্যবহার করা যেতে পারে।

ভেন্ডির সাদামাছি

আক্রমণের ব্যপকতা মাত্রা ছাড়ালে কীটনাশক ডাইফেনথিউরণ প্রতিলিটার জলে ০.৫ গ্রাম হিসাবে গুলে স্প্রে করতে হবে।

লাল মাকড়ের আক্রমণ প্রতিহত করতে ডাইকোফল ২.৫ মিলি বা ওমাইট ১.৫ মিলি প্রতি লিটার জলে গুলে প্রয়োগ করতে হবে।

সূত্র ঃ কৃষ্ণ কর্মকার, বিসিকেভি, কল্যাণী

ভেন্ডি বা ঢ্যাঁড়স চাষে কৃমি সমস্যা ঃ

পশ্চিমবঙ্গে বেলে, পলি ও দোঁয়াশ মাটিতে ঢ্যাঁড়স চাষ করলে কৃমির প্রাদুর্ভাব সর্বাধিক দেখা যায়।

আজকাল প্রায় সব জাতের ঢ্যাঁড়সে কমবেশি কৃমির সমস্যা হয়ে থাকে। শিকড়ফোলা কৃমিটি সবচেয়ে মারাত্মক। কৃমিটির আক্রমণে গাছে শিকড়গুলো ফুলে গাঁটযুক্ত হয়ে পুঁতির মালার মত দেখায়। কৃমি আক্রান্ত শিকড় মাটি থেকে সঠিকভাবে জল ও খাবার নিতে পারে না। ফলে গাছে বাড় -বাড়ন্ত কম হয়, গাছ বেঁটে ও খাটো, এবং হলদেটে দেখায়। কম বয়সের গাছে শিকড়ফোলা কৃমির আক্রমণ হলে আক্রান্ত গাছগুলো নিস্ফলা হয়ে যায়। পরে কৃমির আক্রমণ হলে, আক্রান্ত গাছের ফলন কম হয় এবং কৃমি আক্রান্ত শিকড়গুলোতে মাটিতে বসবাসকারী অন্যান্য জীবাণু যেমন ছত্রাক ও ব্যাক্টেরিয়া সহজে প্রবেশ করে। ফলে কৃমি ও মাটির রোগজীবাণুর মিলিত আক্রমণে শিকড়গুলো দ্রুত পচন শুরু হয়।

ভেন্ডির ক্রিমি জনিত শিকড় ফোলা

কৃমিটির আক্রমণ শুরু হলে দমন করা খুবই কঠিন। তবে এদের নিয়ন্ত্রণে আগাম সতর্কতা ও নজরদারি দরকার। প্রথমতঃ যে জমিতে শিকড়ফোলা রোগের প্রাদুর্ভাব প্রায়শই দেখা যায়, সেক্ষেত্রে কৃমিটির পোষক ফসল (অধিকাংশ সবজিই) চাষ না করাই ভালো। যদি ঢ্যাঁড়শের আগে পোষক ফসল চাষ করা হয়ে থাকে তা হলে জমিতে কৃমির আধিক্য ও সম্ভাব্য ক্ষতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া আবশ্যক ঃ

জমিতে অধিক জৈবসার বা খামারজাত কম্পোস্ট ব্যবহার, জৈব সারের সঙ্গে জৈবনিয়ন্ত্রক যেমন পিসিলোমাইসিস লাইলাসিনাস হেক্টর প্রতি ২.৫ কেজি প্রতি হিসাবে ব্যবহার, খুপিতে সারি করে ঢ্যাঁড়স চাষের ক্ষেত্রে কার্বোফুরান দানা ১২ কেজি একর প্রতি অথবা জৈবসার ও দানা ওষুধ একত্রে ব্যবহারে অধিক সুফল পাওয়া যায়।

ফসল কাটা হলে জমি থেকে গাছের অবশিষ্ঠাংশ ও শিকড় উপড়ে বাইরে নষ্ট করা প্রয়োজন, জমির পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও আগাছা দমন-কৃমি শত্রু নিয়ন্ত্রণে সহায়ক।

(সূত্র ঃ মতিয়ার রহমান খাঁ, বিসিকেভি , কল্যাণী)।

ফসলরোগের ডাক্তারি ঃ নদীয়াতে একটা বড় ধান জমির কোনাকুনি অর্ধেকটা চিটে হয়ে গিয়েছিল। বীজ তৈরির জন্য আই আর ৫৭৯ ভ্যারাইটি চাষ হয়েছিল। বিশেষজ্ঞরা দেখে এসেছেন। পাতায় খোলাপচা এবং ঝলসা রোগের লক্ষণ ছিল। কিন্তু কোনাকুনি অর্ধেক মাঠের ধান শুধু চিটে, বাকিটা নয় কেন- অনেক নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করা হল। তলার পাতাতে ঝলসা এবং খোলাপচার লক্ষণ বেশ স্পষ্ট। হিনোসান আর কুমান-এল ঠিকঠাক দেওয়াও হয়েছিল। কিন্ত ফসল বাঁচানো যায়নি।

চিটে হয়ে যাওয়া ধান

মাঠটা চারপাশ ঘুরে খুঁটিয়ে দেখা হল। চাষীর কাছ থেকে চাষের আদ্যপ্রান্ত জানা হল। চিটে হওয়ার কারণ ঐ দুটি রোগ - এটা কিছুতেই মেলানো যাচ্ছিল না। ঐ রোগে ধান চিটে হয় এমন সম্ভাবনা এক্ষেত্রে অসম্ভব। কোন কারণে দুর্বল হয়ে যাওয়া ফসলের গাছে পরে রোগ দুটি এসেছে বলে মনে হয়। পরিস্থিতিটা একটা বিশেষ কারণের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। ধানের এই ভ্যারাইটি ১০০-১১০ দিনের। তাতে মূলসার ছাড়া একটি চাপানে নাইট্রোজেন সারও পড়েছে। হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে চাপান দেওয়া হয়েছে ৫০ দিনের আশপাশে। ধানপাকার ৩০ দিন আগে ফুল বেরোয় এবং আরও ৩০ দিন আগে কাঁক থোড় তৈরি হয়। এই সময়টা ঐ ধানের অঙ্গজ দশা থেকে ফুল-বীজ দশাতে পরিবর্তন ঘটে। এই সময় নাইট্রোজেন সার হয় ক্ষতিকারক। এর কারণেই ধান চিটে হয়েছে। মাঠের ঢালের দিকে নাইট্রোজেন সারজলে গুলে গিয়ে জমে ছিল। তাই সেই দিকের ধান সব চিট, বাকিটা বেঁচে গেছে। অভিজ্ঞ ধানচাষী কিন্তু পেট টিপে শক্ত দেখে তবে চাপান দেয়। আগে নয়।

নিজে তৈরি করে নেওয়া ওষুধ ঃ

● **টোব্যাকো ডিককসান বা তামাক পাতার নির্যাস ঃ** ৫.০ লিটার জলে ১২৫ গ্রাম নরম সাবান গুলে তার সাথে ১০ লিটারে ১ কেজি তামাক বা দোক্তা পাতা ফুটিয়ে পাওয়া নির্যাসটা মেশালে তৈরি হবে প্রয়োজনীয় টোব্যাকো ডিককসান। এটি ফসলে স্প্রে করে অনেক কীটশত্রু দমন করা যায়।

● **গোবর-গোচোনাগোলা মিশ্রণ ঃ** গোবর এবং গোচোনা বা মুরগীর মল জলে ২০% হিসাবে গুলে ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করা যায়। এই মিশ্রণের ছত্রাক এবং জীবনুনাশক বিশেষত্ব ফসলের রোগ কমাতে সহায়তা করা ছাড়াও ফসলের উপরিস্তরের কোষগুলিতে পেরক্সিডেজ, পলিফেনল অক্সিডেজের ক্রিয়া কলাপ বৃদ্ধি করে। আরো পরে ফসলের উপরিস্থরে কিছু রোগজীবাণু-বিরোধী জীবাণুর সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায়। গোচোনা ও গোবরের সাদামাছিরোধী কার্যকরী ভূমিকা ও স্বীকৃত। একারণে টোম্যাটোর পাতা কোঁকড়ানো এবং লঙ্কার পাতা কোঁকড়ানো রোগের ভাইরাসের ছড়ানো রোধ করে। ধানের খোলপচা রোগ ও এই মিশ্রণ দিয়ে নিয়ন্ত্রণ হয়েছে।

(সূত্র ঃ টি এন এ ইউ ও আন্নমালাই ইউনিভার্সিটি রিপোর্ট)।

সালফার পুষ্টির অভাবের ব্যাধি

জমিতে ও ফসলে একান্ত প্রয়োজনীয় সালফার খাদ্যমৌলের অভাব সৃষ্টি হচ্ছে সাম্প্রতিককালে। সত্তর সালের আগে শোনাও যেত না, কারণ চাষী যে সব নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার জমিতে দিতেন যেমন অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, পটাশিয়াম সালফেট তাদের মধ্যে থাকা সালফারেই চাহিদা মিটে যেত। ক্রমে সালফারহীন নাইট্রোজেন ও ফসফেট সারের যেমন ইউরিয়া ও ডাইঅ্যামোনিয়াম ফসফেট (ডিএপি) ব্যবহার বাড়লো পাশাপাশি উচ্চ ফলনশীল ভ্যারাইটির চাষও বাড়ল। সেচের বৃদ্ধিতে বছরে একাধিক ফসলের চাষও বৃদ্ধি পেল, ফলে মাটিতে সালফারের অভাব।

সালফার যুক্ত সতেজ ধান গাছ সালফার বিহীন গাছ

গাছে সালফারের অভাবের লক্ষণগুলি প্রায় নাইট্রোজেনের অভাবের লক্ষণের মত। ফলে বুঝতে অসুবিধে হয়। সালফারের অভাবে পাতা হালকা সবুজ থেকে হলদে হয়। নাইট্রোজেন পাতার ক্লোরোফিলের অংশ। সালফার নয়। কিন্তু ক্লোরোফিল তৈরী হতে নাইট্রোজেন ও সালফার দুটিরই একান্ত প্রয়োজন। খুঁটিয়ে দেখলে অবশ্য সালফার ও নাইট্রোজেনের অভাবের লক্ষণের তফাৎ বোঝা যাবে । গাছ নাইট্রোজেনের অভাবে ফসলের পুরোন পাতা থেকে নাইট্রোজেন নতুন পাতায় পাঠাতে পারে। সালফারের ক্ষেত্রে পারে না। তাই সালফারের অভাব হলে নতুন বেরোন পাতাও হালকা সবুজ বা হলদে হয় অর্থাৎ সালফারের অভাবে ক্লোরোফিল তৈরী বাধা পায়। ফলে পাতায় হলদেটে থেকে বেগুনি ভাব থাকে।

গাছের শিকড় সাধারণতঃ মাটি থেকে সালফেট (SO_4) অবস্থায় সালফার নেয়। ফসলের মধ্যে সালফার দুই ধাপে বিজারিত হয়। প্রথমেই সিস্টিইন অ্যামিনো অ্যাসিড তৈরী হয়। এছাড়া সিস্টিনোমেথিওনিন ও অন্য (-SH) যুক্ত অ্যামিনো অ্যাসিড ও প্রোটিন তৈরী হয়।

সালফার অনেক প্রয়োজনীয় প্রোটিনের অংশ। অভাবে গাছে প্রোটিন সৃষ্টি ব্যহত হয়। সালফারহীন অ্যামিনো

অ্যাসিড পাতায় জমা হয়। সালফারের অভাবে সালোকসংশ্লেষও কমে যায়। ফলে গাছে শর্করা জাতীয় পদার্থও কমে। এই দুই কারণেই পাতা হলদে হওয়া ছাড়াও পাতা মাপে ছোট ও ডালপালা সরু হয়। গাছের বাড় কমে। ধান জাতীয় দানাশস্য পাকতে বেশি সময় নেয়। ফলনের পরিমান ও গুণমান বেশ কমে। কিছু ফসলের সালফারের অভাবের লক্ষণঃ সর্ষে প্রথমে পাতা হলদেটে এবং পরে মুড়ে কাপের মত হয়। আরও পরে পাতার ভেতর দিকে লালচে ভাব। ফসলের শাখা প্রশাখা ও কান্ডে

সালফার বিহীন সর্ষে গাছ

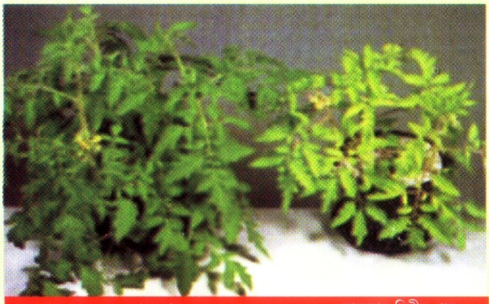

সালফার যুক্ত সতেজ টমেটো গাছ   সালফার বিহীন গাছ

লালচে আভা দেখা যায়। চিনেবাদাম গাছ মাপে ও উচ্চতায় ছোট হয়। গাছের ও পাতার রং হালকা। অভাবে গাছের লতানো ভাব কমে খাড়া হয়। বাদামের পাতার তিনটি পত্রাঙ্ক ইংরাজী 'V' অক্ষরের মত হয়। পুরোনো পাতা সবুজ থাকলেও নতুন পাতা হালকা সুবজ ও পরে হলদে হয়।

টমেটো ঃ- গাছের বাড় কমে বেঁটে হয়। পাতা হালকা সবুজ। গাছে অন্য অংশ হলদেটে। সালফারের বেশি অভাবে পাতার বোঁটাও লালচে হয়।

ধান -প্রথমে পাতার খোলা ও পরে ফলক হলদেটে হয়। অভাব বেশি হলে পাশকাঠি ছাড়ার সময় পুরো গাছটা হলদেটে হয়। পাশকাঠি কমে। কম পাশকাঠিতে ধান ধরে। শীষ ছোট হয়, দানাও কম থাকে। ফলনও কমে। চা গাছে প্রথমে পাতা ছোটও হলদেটে হয়। পরে শাখাপ্রশাখা ও গাছটা ছোট হয়। অভাব বাড়লে পাতা কুঁকড়ে যায়। পাতার ধার ও আগা হালকা বাদামি হয় নতুন পাতাও হলুদ হয়।

পেঁয়াজ ঃ- প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সালফার মাটিতে থাকলে বা গাছ পাতার মাধ্যমে নিলে সালোকসংশ্লেষে ক্ষতি হয়। শিল্পাঞ্চলের পাশে বাতাসে SO_2 বেশি থাকে। সেখানে এমন হয়।

সালফার বিহীন গাছ   সালফার যুক্ত সতেজ বাধাকপি

অভাবে তৈলবীজে তেলের পরিমান এবং অন্য ফসলে প্রোটিনের পরিমান ও কমে।

সর্ষে ও বাঁধাকপি ঃ- অভাব বাড়লে পাতা ছোট হয় ও কুঁকড়ে যায়। পাতায় বাদামি-হলদে রঙ হয়। গাছের সামগ্রিক বৃদ্ধি ব্যহত হয়। সর্ষের ফুল আসেনা বা এলেও পুষ্ট শুঁটি ধরে না। বাঁধাকপি বৃদ্ধির অভাবে কপি আদৌ বাঁধে না।

(সূত্র ঃ অসিত মুখোপাধ্যায়, বি সি কেভি)।

Registered under W.B. Act XXVI of 1961
Registration No. S/1L37974/2006-07,Kolkata

আপনি কি:

- ফসলের কোনো নতুন সমস্যা দেখছেন ?
- কোনো রোগ - পোকা কি অস্বাভাবিক ভাবে বাড়ছে ?
- ফলন কি কম হচ্ছে ?
- অন্য কোন সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন ?
- শস্য সুরক্ষায় নতুন কোনো তথ্য চান ?

তা'হলে এ এ পি পি র সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

-: যোগাযোগের সময় :-

ফোনে প্রতি রবিবার সকাল ১০:৩০ থেকে ১১:৩০ মি: পর্যন্ত
(ড. শ্রীকান্ত দাস ০৯৪৩৩২৮৫১১৫,
ড. মতিয়ার রহমান খান ০৯৪৩৩৩৬২২৯৩)

অথবা

সমাধানের জন্য, চিঠি লিখে বা নিজে এসে যোগাযোগ করুন
প্রতি শুক্রবার সকাল ১১: ০০ থেকে ১২: ৩০ এর মধ্যে
(ছুটির দিন বাদে)

ঠিকানা : ড. শান্তনু ঝা, সচিব, এ এ পি পি,
প্লাণ্ট প্রোটেকশন ইউনিট, বি সি কে ভি,
মোহনপুর, নদীয়া ৭৪১২৫২
দুরভাষ: ০৯৪৩৩০১১৫২৯
ফ্যাক্স: ০৩৩-২৫৮২৮৬৩০